প্রথম অধ্যায়

মানুষ রমেশচন্দ্র সেনের ব্যক্তিজীবন ও তাঁর ব্যক্তিত্ব

সাহিত্য শিল্পীরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। শিল্পীমনের আনন্দ-বেদনা সেই রচনা কর্মে উদ্ভাসিত হয়। শিল্পীর মনোলোক থেকে শিল্পের উদ্ভব বলে শিল্পীর মানস লোককে তাই চিনে নেবার আবশ্যকতা থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন — "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।" ('বঙ্কিম রচনাবলী', ২-য় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, আষাঢ় ১৩৯৭, পৃ: ৮৫৪) দীনবন্ধু মিত্রের রচনা সম্পর্কেও তাঁর একই ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায় — "গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কি-না, জানি না" (তদেব, পৃ: ৮৩৫)

কবি সাহিত্যিকদের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-কর্ম মিলিয়ে পড়লে তবে মূল্যায়ন যথার্থ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সে কথাই বোঝতে চেয়েছেন। বস্তুত সাহিত্যিকরা সাহিত্য সৃষ্টি করে পাঠকের কাছ থেকে বিদায় নেন। 'সহৃদয় হৃদয়সম্বাদী' পাঠক সেই সাহিত্য পাঠে রসাস্বাদন করে। সে ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তার পরিচয়ের প্রাসঙ্গিকতা নেই। কিন্তু সেই সৃষ্টি সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন খন্ডিত। আধুনিক সমালোচকরা তাই সাহিত্যিকদের ব্যক্তি-জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও একই ভাবে বলেছেন "দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে। উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন ও কাব্যের মর্যাদা বেশী করিয়া দেখা যায়।" ('রবীন্দ্র রচনাবলী', জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ: ৮২২) টেনিসনের জীবন চরিত আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্র তথা আধুনিক সমালোচকদের অভিমতকেই সমর্থন করে।

রমেশচন্দ্র সেনের ঔপন্যাসিক কৃতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা তাই তাঁর ব্যক্তি-জীবনের প্রতি আলোকপাত করবো। যেহেতু "উপন্যাসের শিল্পকর্মের বিচারে লেখকের মানস-বিচারই হয়ে থাকে" (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ, ১৯৬২, পৃ: ৩০৬) সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কি প্রকৃতির ছিলেন, তাঁর মনের গড়ন কিরূপ ছিল, তা দেখানো এ পর্বের আলোচ্য বিষয়।

এক — রমেশচন্দ্র সেনের পিতার নাম ক্ষীরোদচন্দ্র সেন। মা ছিলেন বরদা সুন্দরী দেবী। ক্ষীরোদচন্দ্রের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলায় অন্তর্গত কোটালী পাড়া পরগনার অধীনস্থ পিঞ্জরী গ্রামে। যৌবনে তিনি দেশের পাট তুলে কোলকাতায় চলে আসেন। অতঃপর উত্তর কোলকাতার চোরাবাগান ও ঠনঠনে কালিবাড়ী সংলগ্ন অঞ্চলের ২০১- মুক্তরাম বাবু স্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন। সেখানেই রমেশচন্দ্রে জন্ম হয়। জন্ম তারিখ ৭ই ভাদ্র, ১৩০১ (ইংরাজী ২২শে আগস্ট, ১৮৯৪)।

ক্ষীরোদচন্দ্র সেন পেশায় কবিরাজ ছিলেন। কবিরাজ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশের বাড়ীতে যেমন ছিল, কোলকাতা বাস কালেও সেই সুনাম আজীবন অক্ষুন্ন ছিলো। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র লিখেছেন "পিতৃদেব ক্ষীরোদচন্দ্র সেন ছিলেন কলকাতার একজন গণ্যমান্য কবিরাজ। সেযুগের কবিরাজদের আয় ও সমাজে তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তির কথা শুনলে একালের ছেলেরা মনে করবে, গল্প বলছি। আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন আট-দশজন। তাদের জন্য পৃথক একটি ছাত্রাবাস ছিল।" ('কাজলের কৈফিয়ৎ ও অন্য প্রবন্ধ', রমেশচন্দ্র সেন, সম্পাঃ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক - রমেশচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী সমিতি ১৯৯৪, পৃঃ ১) এটি অতিশয়োক্তি নয়। ক্ষীরোদচন্দ্রের সুনাম বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর প্রয়াণে মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডাঃ ক্যালভার্টসন প্রয়াত কবিরাজের স্মৃতির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকায় ক্ষীরোদচন্দ্র 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র সেনও পিতার কাছেই কবিরাজী শিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন। কবিরাজী পেশাতে তিনিও দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

দুই — কোঠালী পাড়া সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান ছিল। ক্ষীরোদচন্দ্রও ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত। তিনি তাঁর পুত্রকে সংস্কৃত শিক্ষালাভের জন্য চতুস্পাঠীতে যথাসময়ে ভর্তি করে দেন। সেখানে অল্পকিছুদিনের মধ্যেই শিশু রমেশচন্দ্র তাঁর মেধার পরিচয় দেন। সে সম্বন্ধে পরবর্তী সময়ে বলেছেন "টোলের আমি পয়লা নম্বরের ছাত্র। টক্‌টক্ করে সংস্কৃত বোর্ডের তিনটে পরীক্ষায় পাশ দিলাম। আর পাশ বল্‌তে পাশ, এক্কেবারে ফার্স্ট। টোলের সেরা ছাত্র আমি। আমায় নিয়ে টোলের গৌরব।" ('কথাশিল্পী', সম্পাঃ শ্রী শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ - শ্রী পরেশ সাহা, ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৬৪, পৃঃ ৯) পন্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের চতুস্পাঠীতে তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু, যার মূলে ছিল সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা। কিন্তু সেটা ইংরেজী বিদ্যাচর্চার কাল। ইংরেজী শিক্ষার জোয়ারে দেশ তখন প্লাবিত। অফিস আদালতে দুকলম ইংরেজী লিখিয়ের স্থান অনেক উঁচুতে। লোকেরা টোলের শিক্ষাকে শিক্ষা বলে গণ্য করত না। রমেশচন্দ্রকেও শুনতে হয়েছে, "অমুকের ছেলেটা মুখ্যু হলো গা।

পয়সাওলা ঘরের ছেলে দুপাতা লেখাপড়াও করলে না! এক্কেবারে বকে গেলো?'' ('কথাশিল্পী' পৃ: ৯) তাছাড়া রমেশচন্দ্রের জ্যাঠাইমা দীনমণি দেবী ''তাঁর 'ছেলে' রমেশকে শুধুমাত্র টুলোপন্ডিত দেখতে নারাজ। তাঁর প্রবল ইচ্ছা 'ছেলে' ইংরেজি শিখুক।'' ('রমেশচন্দ্র সেন', পাঁচু রায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪, পৃ: ৫) আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশী সকলেরই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এমন আগ্রহ থাকায় রমেশচন্দ্র ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। নিজের অগোচরে তাঁর মনে মধ্যে জেদ চেপে বসে। সেই জেদের বশেই ''একদিন কলম নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে বসে পড়লাম। প্রাইভেট। পাশ — এখানেও পাশ। আমিও কি আর থামি? পুরোপুরি শিক্ষিত হ'তে হবে যে! এফ্. এ., তারপর বি.এ.'' ('কথাশিল্পী', পৃ: ৯-১০) ১৯১৭ সালে তিনি কোলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। তাতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। এরপর এম.এ পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর (১৯১৮) ফলে তাঁকে সংসারের সমূহ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চা তাঁর বন্ধ হয়ে যায়।

তিন — পিতার মৃত্যুর পর বাধ্য হয়ে রমেশচন্দ্রকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। মৃত্যুর আগে প্রায় সাত আট বছর হৃদরোগের কারণে ক্ষীরোদচন্দ্র শয্যাশায়ী ছিলেন। তবু সেই অসুস্থতা নিয়েও তিনি রোগী দেখতেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তাঁর পৌত্র মিহির সে কথা জানিয়েছেন, '' রোগী এলে দাদুকে চার হাতলওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে উপরতলা থেকে নীচে নামানো হ'ত।'' ফলে পিতার জীবদ্দশায় সাংসারিক দায়-দায়িত্ব রমেশচন্দ্রের উপর বর্তায়নি, যার জন্যে তিনি বি.এ. পর্যন্ত পড়তে পেরেছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্রের মৃত্যুতে তাঁকে পুরাপুরি সাংসারিক দায়িত্ব নিতে হয়। তিন অনুজের বয়স তখন যথাক্রমে — বার, দশ এবং আড়াই বছর। ইতিমধ্যে বনলতা দেবীর সঙ্গে রমেশচন্দ্রের বিয়ে হয়েছে। বিবাহ বৎসর ১৯১৬। পিতার মৃত্যুর সময় রমেশচন্দ্র এক কন্যার জনক। কন্যা জয়ন্তীর বয়স তখন ছ-মাস। ফলে স্ত্রী-কন্যা-সহোদরদের নিয়ে বিশাল সংসার। সংসার প্রতিপালনের জন্য বংশানুক্রমিক ভাবে চলে আসা কবিরাজী চিকিৎসাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে হয় তাঁকে। শিক্ষা জীবনের মতো কর্ম জীবনেও তিনি অল্পদিনের মধ্যেই দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর চিকিৎসা নৈপুণ্যের কথা সেকালে বহুল প্রচারিত ছিল। বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ জে.সি. গুপ্ত জার্মানীতে গবেষণা করতে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর কাছেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের হৃদরোগ - চিকিৎসা তত্ত্বটি অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে রমেশচন্দ্রকেই বাংলার প্রতিনিধি করে

পাঠানো হয়েছিল। সেকানে তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্পর্কে পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। সম্মেলন মঞ্চ থেকে তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

কর্মজীবনে রমেশচন্দ্র কিছুদিনের জন্য 'বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে' আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যাপনা করেছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো কারণ বশতঃ মতানৈক্য ঘটায় তিনি সেই কর্মে ইস্তফা দেন। এরপর সারাজীবন কবিরাজী পেশাতেই নিয়োজিত থাকেন।

চার — পারিবারিক জীবনাবৃত্তে রমেশচন্দ্র কীধরনের মানুষ ছিলেন জানতে গেলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্মৃতি-কথার শরণ নিতে হয়। স্মৃতি-কথায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য এছাড়া অন্য উপায়ও নেই। কেননা রমেশচন্দ্রের লেখা কোনো দিনলিপি অথবা ডায়েরির সন্ধান মেলেনি। যা হোক, আমরা রমেশচন্দ্রের পারিবারিক আচরণের প্রকৃতিকে দেখে নিয়ে চাই এই জন্যে যে, পারিবারিক এবং সামাজিক এই দুই ক্ষেত্রের সম্মিলিত রূপই ব্যক্তির সমগ্র পরিচয়ের পরিমন্ডল। পারিবারিক বৃত্তে মানুষ অনবগুন্ঠিত ও অকৃত্রিম থাকে বলে সেখান থেকে তার ব্যক্তি চরিত্রের স্বরূপ সন্ধান অনেকবেশী সহজ ও নির্ভুল হয়।

রমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের স্মৃতিতে তিনি ছিলেন 'পিতার মত'। পিতৃ-মাতৃহীন প্রফুল্লচন্দ্রকে রমেশচন্দ্র আপন স্নেহাচ্ছায়ায় লালন করেছেন। সেক্ষেত্রে বনলতা দেবীও তাঁকে 'জননীর' মত স্নেহ দিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের বিয়ের সময় তাঁর এই অনুজের বয়স ছিল আড়াই বছর। জন্মাবধি যিনি মাকে দেখেননি এবং জ্ঞান হবার পূর্বেই যাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে, তাঁকে স্নেহময় পরিচর্চা দিয়ে বড় করে তুলেছিলেন তাঁর দাদা রমেশচন্দ্র এবং বৌদি বনলতা দেবী। রমেশচন্দ্র ভাইকে যে কতটা ভালবাসতেন সে প্রসঙ্গে তাঁর কন্যা শ্রীমতী ডলি সেন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেছেন "বাবা এক এক সময় বুকের ব্যথায় বাড়ী মাথায় তুলে নিতেন। যে যার কাজ ফেলে তাঁর কাছে এসে বসা চাই আর 'ছোটকা' না আসা পর্যন্ত তাঁর সে চিৎকার কিছুতেই বন্ধ হ'ত না।" তিনি আরও জানিয়েছেন, " বাবাকে আমরা পেতাম রাতে, শোবার সময়। আমরা ভাই-বোনেরা অদল-বদল করে বাবার দুপাশে শুতাম। বাবা কিন্তু ছোটকাকে বুকের ওপর শোয়াতেন। বলতেন, ওর যে বাবা মা নেই।" এ হেন আচরণ থেকে স্নেহ-পরায়ণ রমেশচন্দ্রকে খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না।

প্রেম - অপ্রেম, স্নেহ-ঈর্ষা ইত্যাদি মানুষের প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য; জন্মসূত্রে পাওয়া। শিক্ষা-দীক্ষার ফলে ক্রমশ তা শীলিত হতে থাকে। কোনো কোনো মুহূর্তে সেই শীলিত বৈশিষ্ট্যও কিন্তু নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই দুর্বল মুহূর্তের আচরণাদি ব্যক্তিমনের গঠনের সম্যক পরিচয় প্রদান করে। রমেশচন্দ্র সেদিক থেকে কেমন ছিলেন তা জানার অপেক্ষা রাখে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন, "আমরা কেউ কোনো অন্যায় করার পর বউদি জ্যাঠাইমার কড়া শাসন। এঁরা বকাবকি করতে থাকলে দাদা বলতেন, 'আহা! করেই যখন ফেলেছ, কি করা যাবে! আর করবে না!' আবার কখনো কোনো কারণে তিনি রেগে আগুন। পর মূহূর্তেই আমাদের ডেকে হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে বলতেন, যা কিছু কিনে খেয়ে আয়।" মুহূর্তেই রমেশচন্দ্র শান্ত হয়ে পড়ার মধ্যে তাঁর মানসিক প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত হয়।

মনের দিক থেকে রমেশচন্দ্র সংস্কার মুক্ত ছিলেন। সে প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের স্ত্রী দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন — " অন্য কেউ আমায় ঘোমটা ছাড়া অবস্থায় দেখে কিছু বললে দাদা প্রতিবাদ করতেন, বলতেন, ঘরের বউ মেয়ের মতো; ঘোমটা কেন?" একদিন সবাই খেতে বসেছেন সবার থালা থেকেই মাংস নিঃশেষিত। খাদ্যরসিক রমেশ চন্দ্রের আরেকটু চাই। ভাতৃজায়া জানালেন, "দাদা আমার থেকে দেব? উনি সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তৃপ্তি সহকারে খেলেন।" ভাসুর এবং ভ্রাতৃবধূর মধ্যে সমাজ লালিত সংস্কার ও দূরত্ব যা আজও রয়েছে, তা তাঁর ছিলনা। পারিবারিক জীবনে প্রত্যেকের প্রতি তিনি একই রকম আন্তরিক ছিলেন। সদস্যদের এই স্মৃতিচারণ থেকে আমরা রমেশ-চরিত্রের যে বিশেষত্বের সন্ধান পাই তা নিম্নরূপ —

ক) স্নেহশীলতা

খ) প্রচলিত সংস্কার বর্জ্জিত উদার মনোভঙ্গী

গ) নারীর প্রতি মানসিকতায় প্রগতি চেতনা।

পাঁচ — পারিবারিক জীবনে স্নেহশীল কর্তব্যপরায়ণ অবিভাবক রমেশচন্দ্র বৃহৎসমাজ পটভূমিতেও একজন শুভবোধ সম্পন্ন সামাজিক মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির এবং পরোপকারী। কীভাবে মানুষের ভালো করা যায়; তা ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। কেউ তাঁর কাছে নিজের অসুবিধার কথা জানালে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার উপকারের জন্য যথোচিত চেষ্টা করতেন। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ব্যবহার ও আচরণ। তিনি কোন দিনই আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব মানুষ ছিলেন না। মানুষের মধ্যেই তিনি থাকতে ভালবাসতেন, হতে চাইতেন তাদের সুখ দুঃখের সহচর" ('এবং এই সময়', রমেশচন্দ্র সেন সংখ্যা,সম্পাঃ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৭, পৃ: ৬১)। পরোপকারী রমেশচন্দ্রের সহৃদয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে

অজয় নন্দী লিখেছেন, "ওদের বাড়ীর সামনের ছোট্ট বারান্দায় বসে সেদিন গল্প হচ্ছিল। চিত্তদেব, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হিরন্ময়ী দেবী, বিপুল সরকার ও আমি। . . . এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বল্পখ্যাত এক তরুন কবি। . . . কবির অভাবের কথা শুনে কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়লেন উনি। যেন এর জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন; অমনি সুরে বল্লেন, 'চলোতো, আমায় রিক্সায় নিয়ে' — দের' বাড়ীতে একজন প্রাইভেট মাষ্টার চাইছিলেন। বড়লোক। লোকভালো। দেবেও ভালো।" ('প্রথমত', রমেশচন্দ্র সেন জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ- প্রথম সংখ্যা, সম্পাঃ সমর চন্দ, আগষ্ট ১৯৯৪, পৃঃ ৫৪)। বাড়ীতে উপস্থিত অভ্যাগতদের বসিয়ে রেখে সেই কবিকে সাহায্য করবার জন্য তিনি সেদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন। অন্যের উপকারের ব্যাপারে রমেশচন্দ্রের সহৃদয়তার ও ভালোবাসার এমন দৃষ্টান্ত তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির স্বাক্ষর বিশেষ।

সংসারে রমেশচন্দ্রই ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী। দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি বড় হননি বটে কিন্তু উত্তর জীবনে দারিদ্র্য তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। দীর্ঘদিন অসুস্থতার কারণে ক্ষীরোদচন্দ্রের আয় ক্রমশ কমে গিয়েছিল। কর্মজীবনে রমেশচন্দ্র যেমন সুচিকিৎসক ছিলেন, পসার ও তাঁর তেমনি ছিল। কিন্তু অর্থ উপার্জনের দিক থেকে তিনি ততটা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। দেখা যায় একটি "শরৎচন্দ্রীয় প্রকৃতির লাজুক, সাধাসিধা, সহজ মানুষ," ('সমাজ তন্ত্র ও সংস্কৃতি', রবীন্দ্র গুপ্ত, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃঃ ১৪২) রমেশচন্দ্র চিকিৎসার ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিলেন অথচ টাকা পয়সা চাওয়ার ব্যাপারে ছিলেন মুখচোরা। ফলে যে যা খুশী দিত। তিনি বিনা বাক্যে তা গ্রহণ করতেন।

চিকিৎসক রমেশচন্দ্র রোগনির্ণয় ও পরম্পরাময় চিকিৎসা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর নিষ্ঠাকে বজায় রাখতেন। এমনও দেখা গেছে নিজের পয়সায় ঔষধপত্র কিনে রোগীর পাশে গিয়ে হাজির হয়েছেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ, "একবার চর্মরোগ আমার কর্মব্যস্ততাকে বিঘ্নিত করে। তখন রমেশচন্দ্র সেন মশাই-এর কবিরাজী চিকিৎসাধীনে ছিলাম। রোগীর চেয়ে চিকিৎসকেরই বেশি মাথা ব্যথা! নিজেই ওসুধের উপকরণ সংগ্রহ করে কাউকে দিয়ে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন। অনেকবার নিজেও পাইক পাড়ায় হাজির হতেন।" ('এবং এই সময়' - রমেশ সেন সংখ্যা, পৃঃ ৪১) রমেশচন্দ্র এমনি ছিলেন দরদী মানুষ। সেক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধে, অসুস্থতা, বার্ধক্য কোনোকিছুই অন্তরায় হতে পারে নি।

চিকিৎসার ব্যাপারে রমেশচন্দ্রের নিষ্ঠা এবং রোগীর প্রতি তাঁর এমন আন্তরিকতা বশত কেউ একে তাঁর দুর্বলতা বলে সুযোগ নেবার চেষ্টা করলে তিনি কিন্তু সেক্ষেত্রে বিপরীত স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন। নির্মল

সেন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন — "এক ধনী ব্যক্তি অনেক বড় চিকিৎসকের দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছেন, কেননা সে-সব জায়গায় ফি অনেক বেশী। শেষে রমেশচন্দ্রের কাছে আসায় সেন মশাই কিন্তু তার কৌশল ধরে ফেলেন এবং অনেক বেশী টাকা আদায় করে নেন।" 'কানা কোবরেজ' রমেশচন্দ্র এক চোখে দেখতে পেতেন না বটে, কিন্তু তাঁর অন্য চোখের দৃষ্টি ছিল অনেক বেশী সজাগ। সহৃদয় রমেশচন্দ্রের চরিত্র এমনি কোমল ও কঠোর উভয় গুণের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। মানুষ রমেশচন্দ্রের চরিত্রবৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে চিহ্নিত করলে দেখা যায় —

ক) আত্মকেন্দ্রিক নন।

খ) পরদুঃখ কাতর মানসিকতা।

গ) অর্থের প্রতি লোভ হীনতা।

ঘ) চিকিৎসক হিসেবে সহৃদয়তা।

ঙ) প্রবঞ্চিত না হওয়ার মত আত্ম - সচেতনতা।

ছয় — সচেতন নাগরিক মাত্রেরই কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস থাকে। ব্যক্তি যখন দেশ-কালের পরিসরে বসবাস করে তখন তার দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন রাজ্য-রাজনীতির প্রতি নিবদ্ধ হয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালন-কৌশল, নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের মধ্যে শাসকের যে ভাবসত্তার প্রকাশ ঘটে, তার প্রতি সমর্থন বা সমালোচনা একজন সচেতন নাগরিকের থাকা স্বাভাবিক। কেননা প্রত্যেকেই একটি স্বকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে জনগণের শুভাশুভের কথা চিন্তা করে। যখন প্রচলিত মতাদর্শের কোনোটিকেই শ্রেয় বলে বিবেচিত না হয় তখনি ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় নতুন মতাদর্শের আর্বিভাব ঘটে। শিল্পী-সাহিত্যিক "যথার্থ সামাজিক জীব" ('প্রবন্ধ সংগ্রহ', প্রমথ চৌধুরী; বিশ্বভারতী, ১৯৭৪, পৃঃ ৯৬) বলে সমাজ সংসারের সংঘাত - সংঘর্ষে ঝংকৃত হয় তাঁদের স্পর্শ কাতর হৃদয়তন্ত্রী। চেতনে - অবচেতনে তাই প্রত্যেক লেখকই কোনো না কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।

রমেশচন্দ্র প্রথম জীবনে একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি ১৯২৩ - ২৬ সাল পর্যন্ত উত্তর কোলকাতার কংগ্রেস সম্পাদকের দায়িত্বভার বহন করেছিলেন। তাই বলে সে যুগের কোনো কোনো নমরপন্থী কংগ্রেসীদের মতো তাঁর মধ্যে কোনোরূপ অন্ধত্ব ছিলনা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র সদস্যদের মধ্যে অনেকেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

"চৌরিচৌরার ঘটনার পর এঁদের অনেকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। খানা তল্লাসি হয় রমেশচন্দ্রের ২০১ মুক্তারামে।" ('রমেশচন্দ্র সেন', পাঁচু রায়, পৃ: ১৯) চরমপন্থী মতাবলম্বীরা অসময়ে অনায়াসেই তাঁর গৃহে আশ্রয় পেতে পারত। ফলে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ চরমপন্থী ও নরম পন্থী উভয় মতাদর্শেরই সম্মেলন ঘটে ছিল। সমিতির কোনো বৈঠকে সরোজ আচার্য মার্কসীয় দর্শনের উপর তত্ত্বগর্ভ আলোচনা করেন, আবার ত্রিশের দশকে যখন "কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে যে দেশ স্বাধীন হলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দি" ('এবং এই সময়', পৃ:৯) তখন সমিতির পক্ষ থেকে বহু প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সমিতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে স্বয়ং রমেশচন্দ্রের উল্লেখ থেকে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের ঋজুতাকে স্পষ্ট রূপে ধরা যায়। এ থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যে স্বচ্ছও যুক্তি নির্ভর ছিল সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কংগ্রেসের দেশ ভাগ করে দেশে স্বাধীনতা আনার সিদ্ধান্তকে তিনি কোনোমতেই মেনে নিতে পারেন নি। সে জন্যে "দেশ ভাগের পরে কংগ্রেসের ধারেকাছেও তাঁকে কেউ দেখেনি।" ('প্রথমত', রমেশচন্দ্র সেন সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৯৮৬, পৃ: ১৪) প্রবীর সেন একথা উল্লেখ করেছেন।

রমেশচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে দু'রকম কথা শোনায়ায়। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, রমেশবাবু যে মোটামুটি ভাবে বামপন্থী প্রগতিশীল আদর্শেরই অনুরাগী ছিলেন, আমার মত ঘনিষ্ট ব্যক্তিরা তা জানতেন" ('এবং এই সময়', পৃ: ৪৮) আবার শুদ্ধসত্ব বসু লিখেছেন, "তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি - কংগ্রেসী মতবাদেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট।" ('এবং এই সময়', পৃ: ৫৩) দু'জনেরই এই পরস্পর বিরোধী কথা থেকে যে সংশয়ের অবতারণা হয় তার সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় গোপাল হালদারের উক্তিতে। তিনি বলেছেন, "গান্ধীর প্রতি অনুরক্ত হলে মার্কস - লেনিনের শিক্ষা গ্রহণে অকাট্য বাধা হাজির হয় — এ কথা মানা চলে না। রমেশবাবুকে একটা মার্কা লাগিয়ে বিচার করতে না হয় না-ই লাগলাম" ('এবং এই সময়', পৃ: ৭৪)। বস্তুত কংগ্রেসের মধ্যেই একটা অংশে বামপন্থী প্রগতি চিন্তার প্রচলন ছিল। রমেশচন্দ্রের মনে প্রগতিশীল বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ প্রথমাবধিই ছিল। সে সময় সব প্রগতিশীল মানুষই কংগ্রেসকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। রমেশচন্দ্রও তাই করেছেন। অরবিন্দের প্রতি অনুগত রমেশচন্দ্র মানুষের প্রতি সমবেদনা থেকে যে জীবনদর্শনের সন্ধান পেয়েছিলেন সেখানে ডানপন্থী ও বামপন্থী দুই মতাদর্শ একই মোহনায় মিলেছে। তাঁর এই মনোলোকের রূপায়ণ তাঁর উপন্যাস গুলির মধ্যে দেখতে পাই। মানবতাবাদী রমেশচন্দ্র শুধু মানুষের দুঃখে চোখের জল

ফেলেই সান্ত্বনা লাভ করেন নি, বরং ইতিহাসের গতি চিত্রণ করে তিনি মানুষের কল্যাণের পথ-নির্দেশিকাও রচনা করেছেন। সুতরাং তাঁর মানবতাবাদের দিগদর্শন ছিল বিশেষ রাজনৈতিক ইতিহাস বিচার, এবং সেই ধারনানুসরণ। সেদিক থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে নাহলেও ভাবগত দিক থেকে বামপন্থী রাজনীতি চেতনার প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে —

ক) প্রথম জীবনে রমেশচন্দ্র একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী।

খ) কংগ্রেস কর্মী হলেও অন্ধ নন, অন্য রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

গ) বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আস্থা।

সাত — ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রের সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়েছিল গল্প লেখার মধ্যদিয়ে। শৈশব থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, — ''ছোটবেলা থেকেই কালিকলম নিয়ে মক্‌সো করতাম। গল্প লিখতাম। কবিতা লিখতাম। তাদের জন্মতো আর বাঁচার জন্য হয়নি। কাজেই কোন কোনটির জন্মলগ্নেই মৃত্যু হয়েছে। কোন কোনটির বা ক'দিন পরে।'' ('কথাশিল্পী', পৃ: ১০) সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের ফলেই ১৯১১ সালে মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাহিত্য প্রচার সমিতি', যার পরিবর্তিত নামকরণ করা হয়েছিল 'সাহিত্য সেবক সমিতি'। ক্ষীরোদচন্দ্রের কাছে যারা শিক্ষানবিশী করতেন, তাদরে নিয়েই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সমিতি। প্রথম দিনের ৯ জন সভ্যের মধ্যে ৮ জনই ছিলেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষার্থী। রমেশচন্দ্র ছিলেন সেই সমিতির কর্ণধার।

১৯১৮ সালে বীরবলের সভাপতিত্বে সমিতির যে অধিবেশন হয়েছিল তা'তে রমেশচন্দ্র 'রাজার বানর' ও 'দরিদ্রের ক্ষুধা' নামে দুটি স্যাটায়ার ধর্মী গল্প পড়েছিলেন। বীরবল সেই গল্প সমন্ধে কোনো রকম উৎসাহ প্রকাশ না করায় রমেশচন্দ্র আহত হন এবং স্যাটায়ার লেখা ছেড়ে দেন। তারপর দীর্ঘ বিরতি। ১৯২৮ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শরতের মেঘ' গল্প লিখে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এই দীর্ঘ বিরতি কালে সমিতি পরিচালনার পাশাপাশি তাঁর লেখালেখির অনুশীলনও চলেছিল। ১৯২৮ এর পর থেকে ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি ছোটগল্প 'মাসিক বসুমতী', 'বিচিত্রা', 'গল্প লহরী', 'সর্বহারা', 'উত্তরা', 'সোনার বাংলা', 'দেশ' ইত্যাদি নামকরা সব সাহিত্যে পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকে। এবং অল্পদিনের মধ্যেই কৃতী গল্পকার হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পান।

'রাজার জন্মদিন', 'ওরা তিনজন', 'মৃত ও অমৃত', 'যৈবন', ইত্যাদি বিখ্যাত ছোট গল্পের স্রষ্টা সর্বমোট একশ একুশ খানা ছোট গল্প রচনা করেছেন। ১৯৩৬ এ 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর 'টিকি বনাম প্রেম' উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে এটি 'পূর্বরাগ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৩৬৮)। ১৯৪৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শতাব্দী'। এরপর 'কুরপালা', 'চক্রবাক', 'কাজল' ইত্যাদি ছোট বড় ১৩ খানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর একবছর আগে তিনি যখন কলম ধরবার ক্ষমতা হারিয়েছেন, সেই অবস্থাতেও তাঁর সারস্বত সাধনা থেমে থাকেনি। সমিতির সদস্য পাঁচু রায় 'অপরাজেয়' উপন্যাস তাঁর কাছে শুনে শুনে অনুলিখনে নিযুক্ত ছিলেন।

কৈশোর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্যকর্মে আত্মমগ্নতায় তাঁর কোনোরূপ শৈথিল্য ছিল না। লেখার ব্যাপারেও তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রয়েছে। সে ব্যাপারে শুদ্ধসত্ত্ব বসু লিখেছেন, '' তাঁর লেখার জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল — তা নয়। যখনি সময় পেতেন, লিখতেন; হয়তো কাগজ কাছে নেই, ক্যালেন্ডারের পাতার পেছনেই একটা গল্পের গোড়ায় দিকটা লিখে ফেললেন।'' ('এবং এই সময়', প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩) 'কথা শিল্পী'র সম্পাদকদ্বয় এক ভাদ্রের বিকেলে গিয়ে রমেশচন্দ্র সেনকে লিখনরত অবস্থায় দেখেছিলেন। সমস্ত কাজের ফাঁকে তিনি এমনি ভাবে লেখা, পড়া এবং অন্যের লেখা সংশোধনের কাজে নিয়োজিত থেকেছেন।

রমেশচন্দ্র তাঁর সাহিত্য চর্চার প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর বাবা ক্ষীরোদচন্দ্রের কাছ থেকে। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে পাই, ''সংস্কৃত কবিতা রচনায় তাঁর (ক্ষীরোদ চন্দ্রের) দক্ষতা ছিল অনেক খানি। পিতার এই সাহিত্য প্রীতি রমেশচন্দ্রের সাহিত্য জীবনকে করে বিশেষ প্রভাবিত।'' ('প্রথমত', পৃ: ১) রমেশচন্দ্র যে সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা প্রথমদিকে ক্ষীরোদচন্দ্রের অর্থানুকূল্যেই চলেছিল। অর্থাৎ পুত্রের সাহিত্য সাধনার পরিবেশটি তিনিই রচনা করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র পিতার কাছ থেকে কবিরাজী শিক্ষা এবং সাহিত্য সাধনার প্রেরণা দুটোই পেয়েছিলেন এবং দুক্ষেত্রেই তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর পসার হলেও পিতার মতো অর্থ উপার্জন করতে পারেননি। অর্থের প্রতি উদাসীন রমেশচন্দ্র সাহিত্যের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। সে যুগে অর্থলক্ষ্মী এবং সাহিত্য সরস্বতীকে কোথাও যুগপৎ একসঙ্গে অবস্থান করতে দেখা যায় না। রমেশচন্দ্রের বেলায় তাই দারিদ্র্য তাঁর সংসারে এসে আস্তানা গেড়েছিল।

সংসারের প্রতি উদাসীন রমেশচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতি একাগ্র থাকবার ব্যাপারে স্ত্রী বনলতা দেবী যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। "পাঁচ পুত্র এবং নয় কন্যার জননী এই অসামান্যা মহিলাটি বৃহৎ পরিবারের সমস্ত দায় একা সামলেছেন। রমেশচন্দ্রকে সৃজনশীলতায় উদ্দীপ্ত করে যেতে স্নিগ্ধতায় স্নাত করেছেন বছরের পর বছর।... ফলত এই মমতাময়ী জীবন সঙ্গিনীর জন্যই রমেশচন্দ্রের গৃহজীবন এবং সাহিত্যিক জীবনের অনুষঙ্গ কোনোদিন হতাশার দগ্ধতায় আক্রান্ত হয়নি"। ('পুনরুত্থান', রমেশচন্দ্র সেন জন্ম শতবর্ষিকী সমিতি, ১৯৯৫, পৃ: ২০) তাছাড়া সাহায্য করেছেন কম্পাউন্ডার হরিদাস রায়চৌধুরী। হরিদাসবাবু সম্পর্কে পাঁচুরায় লিখেছেন, "এ মানুষটি তাঁর আত্মীয়স্বজন দ্বারা প্রতারিত হয়ে একদিন চলে এসেছিলেন কলকাতা। ঘটনা চক্রে এসে পড়ে গিয়েছিলেন মুক্তরামের কোনও এক রকে। তাঁর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রমেশচন্দ্র গভীর আন্তরিকতায় তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমার একগ্রাস ভাত জুটলে তোমারও জুটবে। রমেশচন্দ্রের বাকী জীবনে তাঁর একান্ত সহচর ছিলেন এই হরিদাস বাবু। এই মানুষটি রমেশচন্দ্রকে ভালোবেসে তাঁর গোটা পরিবারকেই ভালোবেসে ফেলেছিলেন।" ('রমেশচন্দ্র সেন', পৃ: ২১) অকৃতদার ছিলেন তিনি। চিকিৎসক রমেশচন্দ্রের পেশাগত কাজে অন্যতম সহায়ক হরিদাসবাবুই রমেশ পরিবারের চালডাল তেল নুনের খবরও রাখতেন। তাঁর এই দায়িত্বে অনেকটা নিশ্চিন্ত থেকে রমেশচন্দ্র সাহিত্য কর্মে মগ্ন থাকতে পেরেছেন।

রমেশচন্দ্র আজীবন কোলকাতার বাসিন্দা কিন্তু তাঁর লেখায় গ্রাম বাংলা জীবন্ত রূপে ধরা দিয়েছে। এর কারণ পূর্ব বাংলার সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য পূর্ববাংলা থেকে ছাত্ররা আসতো। এছাড়া বিভিন্ন পূজা-পার্বণে আত্মীয়-স্বজনের আসা যাওয়া ছিল। সেই সুবাদে গ্রামের প্রতি, গ্রাম জীবনের প্রতি রমেশচন্দ্রের এক আলাদা মোহ জেগে উঠেছিল।

রমেশচন্দ্রের এই বঙ্গপ্রীতির পরিচয় রয়েছে চিত্তরঞ্জন দেবের কলমে। তাঁকে এক সময় রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, "তুমি যখন সুর করে গান গুলি পড়ছিলে, — 'এত রাইতে ক্যানে ডাক দিলিরে প্রাণ কুকিলা-' তখন আমার কি মনে হচ্ছিল জান? আমি বুঝি ফিরে গেছি আমার জন্মভূমি "পিঞ্জরী" গ্রামের মধ্যে। আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম আমাদের গ্রামের সেই বৈরাগীর কণ্ঠস্বর।" ('এবং এই সময়', পৃ: ৩৩) মনে হয়, 'শতাব্দী' উপন্যাসের মঞ্জরীগ্রাম আসলে পিঞ্জরী নামেরই রূপান্তর। দেশভাগের পর কোলকাতায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের দৈন্যদশা দেখে তিনি ব্যথাহত হয়েছিলেন। তাইতো শিয়ালদা অঞ্চলের কলোনীগুলোতে বার বার গিয়ে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। কখনো চিত্তরঞ্জন দেব তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

রমেশচন্দ্র কবিরাজী সূত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বড়লোক বাড়ীতে যেমন তাঁকে যেতে হয়েছে তেমনি জীর্ণ কুটিরেও জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার অনেক বেশী পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে তাঁর নিজেরই অভিমত, "এই ব্যবসার খাতিরেই আমায় অনেক জায়গায় যেতে হয়। অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। বিচিত্র জগতের বিচিত্র লোক। তাদেরি সাজ পোষাক পেরিয়ে দরবারে নামিয়ে দি'। আমার গল্প উপন্যাসে তাই চেনা জানা মানুষের ভিড়।" ('কথাশিল্পী', পৃ: ১০) চিকিৎসকের ধৈর্য্য, নিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতা তাঁর রচনাকে স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ করেছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, " মানুষের রোগের চিকিৎসা করতে করতে অনিবার্যভাবে তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে সময়, সমাজ ও অস্তিত্বের বিবিধ রোগের উপসর্গ ধরা পড়েছে। চিকিৎসক হিসেবে তিনি জানেন মানুষ কি ভীষণভাবে বাঁচতে চায়, কি অপরাজেয় তার জীবনীশক্তি ও বাঁচার বাসনা।" ('এবং এই সময়', পৃ: ৮০) এজন্যেই তাঁর উপন্যাস শিল্পে মানুষের বাঁচার কথা ফিরে ফিরে আসে। উপন্যাসের উপসংহারেও তাই বিবৃত কাহিনী বিন্যাস — কাহিনীর শেষ হয়েও কল্যানকারী সমাজের স্বপ্ন ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে।

দেখা যাচ্ছে — ক) পিতার অনুপ্রেরণাতে রমেশচন্দ্র সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন।

খ) গল্প লেখক হিসেবেই প্রথম পরিচিতি, অতঃপর উপন্যাস লেখা।

গ) পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় কোলকাতা নিবাসী রমেশচন্দ্রের নষ্টালজিক মন তৈরী হয়।

ঘ) চিকিৎসা সূত্রে সাধারণের আত্মীয় তিনি।

ঙ) চিকিৎসক রমেশচন্দ্রের হৃদয়ধর্মই তার উপন্যাসের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

আট — রমেশচন্দ্র সেন নিজে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে যেমনি একনিষ্ঠ ছিলেন তেমনি উৎসাহিত হতেন কেউ যেদি সাহিত্য চর্চায় এতটুকুও আগ্রহ দেখাতো। নূতন সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ছিলেন সপ্রাণ। এ প্রসঙ্গে বারিদবরণ ঘোষ লিখেছেন — "কবিরাজের কবি সত্তাটি রমেশচন্দ্রের হৃদমূলে অবস্থিত ছিল। তাঁর এই কবিসত্তাটি দু'ভাগে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিল — সাহিত্য চর্চা এবং সাহিত্য সেবায়। নিজে লিখেছেন এবং অপরকে লেখার অবকাশ করে দিয়েছেন। সেজন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন সাহিত্য সেবক সমিতি।" ('দেশ', ২২শে এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃ: ১২১) সাহিত্য সেবক সমিতি তাঁর কাছে ছিল সন্তানের মতো।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তিনি তাকে লালন করেছেন। প্রতিটি অধিবেশনের জন্যে পায়ে হেঁটে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে কবি-সাহিত্যিকদের, সাহিত্যানুরাগীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আসতেন। সাংসারিক অভাব অনটন, শারীরিক অসুস্থতা কোনো কিছুই সে অদম্য আগ্রহের সামনে বাধা হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি।

পঞ্চাশ বছরে সমিতির সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা যুক্ত থেকেছেন তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত সুর চৌধুরী, পুলকেশ দে সরকার, শুদ্ধসত্ব বসু প্রমুখ প্রায় শতাধিক সাহিত্যরথীর নাম উল্লেখযোগ্য। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, কামিনী রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরলা দেবী চৌধুরানী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অতুল চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ বরেন্য সাহিত্যিকরা। মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর সেই সমিতিতে সাহিত্যচর্চায় অংশ গ্রহণ করতেন সে যুগের প্রায় সকল সাহিত্যিকরাই। বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল', 'কালি কলম', 'প্রগতি' ইত্যাদি অনেক সাহিত্য গোষ্ঠীই সমকালে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু সেইসব গোষ্ঠী দীর্ঘায়ু হতে পারে নি। রমেশ চন্দ্রের প্রচেষ্টায় তাঁর সাহিত্য সমিতির দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পদচারণা এবং তা সাহিত্য চর্চার উদার ক্ষেত্র হয়ে ওঠা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সমিতিতে এসে একদল যেমন আত্মতৃপ্তিকে রাঙিয়ে নিয়ে যেতেন, অন্যদল তেমনি তাঁদের কাঁচা হাতকে শীলিত ক'রে নিতে সক্ষম হতেন। কর্ণধার রমেশচন্দ্র সেদিনের তরুণ সাহিত্যিক প্রজন্মকে সত্য সত্যই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। উঠতি লেখকরা কতটা সাহায্য পেতেন তাঁর কাছে সে প্রসঙ্গে দেবব্রত সুর চৌধুরী লিখেছেন, " আমার প্রথম রচিত কয়েকখানি নাটক তখন অপ্রকাশিত। . . . একদিন তিনি আমাকে আমার একটি নাটক সমিতিতে প'ড়ে শোনাতে বলেন। . . . নাটক পাঠের পরদিন রমেশ বাবু আমাকে আমার নাটকটি সহ গুপ্ত প্রেসে উপস্থিত হয়ে প্রেসের মালিক সুদর্শন যুবক টেনিস খেলোয়াড় শ্রী ভোস (বোস) কে নাটকটি প্রকাশ করতে বলেন। এই বলার মধ্যে অনুজ্ঞা ও ঔচিত্যের যে ভারসাম্য ছিল তা শ্রী ভোসের মনে তৎক্ষণাৎ প্রত্যয় উৎপাদন করেছিল। . . . সেই সংস্থা থেকে আমার প্রথম নাটক 'জীবনায়ন' প্রকাশিত হয়।" ('এবং এই সময়', পৃঃ ৬৫)। ঠিক একই কথার পুণরুল্লেখ রয়েছে চিত্তরঞ্জন দেবের স্মৃতি চারণায়। তিনি লিখেছেন, " কি ভাবে তরুণ সাহিত্যিকরা দাঁড়াতে পারবে — এই যেন ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। . . . তাদের লেখা শুনেছেন, প্রয়োজন বোধে সংশোধনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এরপর আবার তাদের সেই সব লেখা নিজে পকেটে ক'রে নিয়ে গছিয়ে দিয়ে এসেছেন কোন না কোন সম্পাদকীয় দপ্তরে। এই সব লেখকরা

যখন পরবর্তী কালে স্বনাম খ্যাত হয়েছেন, তখন উনিই আগবাড়িয়ে, দশ জনকে ডেকে বলতেন — শুনেছ ভাই, অমুকের ওই বইটার নাকি খুব প্রশংসা হচ্ছে; পড়ে দেখো।'' ('এবং এই সময়', পৃ: ৩৪ - ৩৫) একই প্রবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন,'' আমার সাহিত্যিক জীবনের সেটুকু সফলতা লাভ করেছি, তার প্রায় সবটুকুই তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায়।'' (পৃ: ২৯) অনুজ লেখকদের প্রতি অনুরাগ এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করার মধ্যে তিনি আলাদা তৃপ্তি অনুভব করতেন। ''তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম গল্পটি সমিতির আসরেই পড়েছিলেন।'' ('দেশ' - ২২ শে এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃ: ১২১)

এমনি অনেক নূতন লেখককে রমেশ চন্দ্র তাঁর সমিতিতে সদস্যরূপে স্থান করে দিয়ে তাদের সাফল্যের পথে সাহায্য করেছেন। শিবরাম চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন ''আমার কাছে সাহিত্য আলোচনার জন্য উৎসুক কেউ এলে ... আমি তাঁদের রমেশ বাবুর ঐ আড়তে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতাম। রমেশ বাবু সানন্দে নিজের সমিতির সভ্য হিসাবে তাঁদের লুফে নিতেন। আর তাঁরাও মাসিক চার আনা মাত্র চাঁদার বিনিময়ে ঢালাও আড্ডা আর আলোচনার সুযোগ পেত — সেই সঙ্গে চা কচুরী সিঙ্গারা তো মিলতই। সেদিক দিয়ে ওটা ছিল আমার জ্যাম্পিং গ্রাউন্ড।'' ('এবং এই সময়', পৃ: ৬৮-৬৯) নূতন সাহিত্যিকদের সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা সে যুগে এক বিরল দৃষ্টান্ত। অন্যের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর সহৃদয় প্রচেষ্টায় অনেক লেখকই পরবর্তী সময়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁদের লেখা নিয়ে প্রকাশকদের কাছে যেতে তাঁর কোনোরকম সংশয় ছিলনা, সে কথা আমরা অজয় নন্দী এবং চিত্তরঞ্জন দেবের লেখা সূত্রে জানতে পারি। সেই সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করার মতো যে নিজের লেখা নিয়ে কখনোই তিনি প্রকাশকের কাছে যাওয়ার গরজ দেখাতেন না, কারো কথায় লেখা পাঠিয়ে দিলেও তা প্রকাশে বিলম্বের কারণ সম্পর্কে কোনো খোঁজ খবর করতেন না। নিজের লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি এমনি ছিলেন অন্তর্মুখী স্বভাবের। তাই দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যচর্চা করলেও, নামী দামী পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রশংসিত ছোট গল্পের অনেকগুলি প্রকাশ হলেও সেইসব ছোট গল্প বা উপন্যাস বই হয়ে বের হতে অনেক বছর কেটে যায়। ১৯৪৫ সালে 'শতাব্দী' প্রস্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বই। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন, ''ওটা বেরোয় যখন আমার বয়েস পঞ্চাশ বছর। অনেকে বলেন, লিখছেন ছোট বেলা থেকে, আর আপনার প্রথম বই বেরোতে বয়েস ভাঁটা লেগে গেলো? আমি হাসি। ও আমার অবিমিশ্র হাসি নয়। ও হাসির মোড়ক দিয়ে একটা বেদনার ইতিহাসকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা।'' ('কথাশিল্পী', পৃ: ১১) স্বভাব লাজুক রমেশচন্দ্র মনের বেদনাকে বাইরে প্রকাশ করেননি ঠিকই কিন্তু ভেতরে ভেতরে এ ব্যাপারে বেদনা অনুভব করেছেন। আসলে যিনি একটি সাহিত্য সমিতির কর্ণধার,

189628
26 FEB 2007
LIBRARY
NBU, DARJEELING

অন্যের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে আন্তরিক, তাছাড়া গল্পকার হিসেবে পরিচিতিও পেয়েছেন, এমন সাহিত্যপ্রাণ লেখকের রচনা অনায়াসেই বই হিসেবে প্রকাশ হবার কথা। কিন্তু দেখা গেল 'শতাব্দী' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও বিভিন্ন প্রকাশনা দপ্তর থেকে ফিরে এসেছে।

নিজের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে তিনি কাউকে কখনো অনুরোধ করেননি। পাশাপাশি এও দেখা যায় সম্ভ্রম বোধে উন্নীত "একগুয়ে আত্মমর্যাদা"র ('রমেশ চন্দ্র সেন', আবু বকর সিদ্দিকী, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ-২৫) জন্যে তাঁর রচনা প্রকাশের মুখ দেখতে সময়ক্ষেপ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে নির্মল সেন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন— "রমেশ বাবুর একটা লেখা 'যুগান্তরে' ছাপানোর পূর্বে কিছু পরিবর্তন করতে বলায় তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন এবং সেটি ফেরত নিয়ে এসেছিলেন। ফেরার পথে নির্মল সেনকে শুধু বলেছিলেন "কি দুঃসাহস, আমার লেখায় ও কলম চালাতে চায়।" নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর এমন অনমনীয় মানসিকতা গ্রন্থ প্রকাশের অন্তরায় রূপেও কাজ করেছে।

রমেশ চন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ বাংলা ১৮ ই জৈষ্ঠ, ১৩৬৯ সন। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তটিও স্মরণ করার মত। পুত্র মিহির সেন সেদিন বাবার মৃত্যুর কথা কল্পনা করতে পারেন নি। তাই যথারীতি অফিস থেকে ফেরার পর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁকে ডাকায় তিনি বাবার পাশে গিয়ে বসেছেন। এরপর "বাবার বুক থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ হতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা কাশি হয়েছে? বাবা বললেন, 'না, শ্বাস উঠেছে। ... আমাকে নিচে নামিয়ে দাও। ... উনি নিজেই সমস্ত শরীরটা মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন। ... মাটিতে শোয়াবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাঁ দিকে পাশ ফিরলেন। গলার শিরাটা কয়েকবার দপদপ করল। তার পরই সব শেষ হয়ে গেল।" ('পুনরুত্থান', পৃ: ২৭) চিকিৎসক রমেশ চন্দ্র চিকিৎসা করতে করতে জন্ম ও মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন, নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে তাই তিনি এমনি নির্বিকার থাকতে পেরেছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই নির্মোহ বৈশিষ্ট্য তাঁর কথা সাহিত্যকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে। জন্ম এবং মৃত্যুর যথার্থ দৃশ্য আঁকতে তাঁর তুলি কখনোই রঙের অপচয় করেনি।

তাহলে আমরা বলতে পারি —

১) অন্যের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে তিনি প্রকাশকের কাছে বিনীত।

২) অথচ নিজের উপন্যাসগুলি প্রকাশের বিলম্বতার একটি কারণ, রমেশ চন্দ্রর স্বাভিমানবোধ।

নয়ঃ ব্যাক্তিসত্তাকে যদি হীরক খন্ডের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে ব্যাক্তিত্বকে বলা যেতে পারে সেই

হীরকখন্ড থেকে বেরিয়ে আসা আলোকছটা। ব্যক্তির আচার-আচরণ, এক একটি বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ-অনাগ্রহ, নিজস্ব সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য লুব্ধতা অথবা উদাসীনতা, সামাজিক বিধি বিধান সম্পর্কে সংশয়-আস্থা, অন্যের সুখ-অসুখে নিরুত্তাপ অথবা আকুলতা ইত্যাদি সমগ্রতা নিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। ব্যাক্তিত্ব আর আচরণ একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তিত্বের মূলে থাকে ব্যক্তির নিজস্ব জীবনদর্শন। লেখক শিল্পীদের রচনা কর্মে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন দুর্লক্ষ্য নয়। "শিল্পীর জীবনবোধ, বা প্রতীতিবোধ অবশ্যই তার শিল্পে প্রতিফলিত হবে, শিল্পসম্মতভাবেই সেটা পরিবেশিত হবে।" ('প্রসঙ্গ ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য', নীলরতন সেন, সাহিত্যলোক, ১৯৮৭, পৃ: ২৩৮)। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় কবির জীবনবোধকে খুঁজে পেয়েছিলেন। শিল্পী রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেও তাঁর ব্যক্তিত্বকে তথা তাঁর জীবন বোধকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি।

আমরা বলেছি যে, রমেশচন্দ্র কিছুটা সংসার উদাসীন, পরদুঃখকাতর, সাহিত্য অন্তপ্রাণ মানুষ ছিলেন। অর্থের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না বটে, কিন্তু কেউ সেই বৈশিষ্ট্যকে দুর্বলতা হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে তিনি সেক্ষেত্রে পুরোমাত্রায় ছিলেন সজাগ। দেবব্রত সুর চৌধুরী বলেছেন, "একটি যষ্টি হাতে তিনি চলতেন বটে, কিন্তু কদাচিৎ তাঁকে তার উপর নির্ভর করতে দেখেছি। ... দীর্ঘ দেহে মেরুদন্ড ঋজু, পদক্ষেপ দৃঢ়, চলার সময় এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ পেত না।" ('এবং এই সময়', পৃ: ৬৪) বুঝি এই পরিচয়ের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি ধরা আছে। আজীবন তিনি মেরুদন্ড সোজা করেই বেঁচে ছিলেন। নিজের দারিদ্র্য এবং গ্রন্থপ্রকাশ কোন ক্ষেত্রেই অন্যের উপর নির্ভর করার মানসিকতা তাঁর ছিল না। অথচ অন্যের অভাব-অনটনে তিনি বিচলিত হতেন, তাই তাকে সাহায্য করতে ছুটে যেতেন। চিকিৎসার সূত্রে তিনি সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যকে সম্যকভাবে লক্ষ করেছেন। সেজন্যেই বিত্তহীন-শ্রমনির্ভর মানুষের মঙ্গল চেয়েছেন। একদিনের কংগ্রেস কর্মী রমেশচন্দ্র মানুষের মুক্তির প্রয়াসে পরবর্তী সময়ে মার্কসীয় জীবনভাবনায় প্রাণিত হয়েছিলেন। 'শতাব্দী' থেকে 'অপারাজেয়' পর্যন্ত প্রধান প্রধান উপন্যাসে তাঁর সেই জীবনবোধের বিবর্তন ক্রমশঃ প্রগাঢ় হয়েছে। আর সেই সব উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবনকেই আঁকতে সমর্থ হয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে ব্যাক্তি রমেশ চন্দ্রের ব্যক্তিত্বের ছটা, তার জীবন দর্শন, সমাজ-সমীক্ষার দিককে উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত হতে দেখব।

এখানে এটুকু বলে রাখা যায় যে, উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন থেকে তার শিল্পিত রূপায়ণ পর্যন্ত সবই তাঁর ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রোজ্জ্বল।

ব্যক্তি রমেশচন্দ্রের মানস লোককে মনে রেখে আমরা তাঁর উপন্যাস শিল্পের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।